পুরী নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা

স্বামী জগন্নাথানন্দ

হে দেব হে দয়িত হে জগদেকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥

শ্রীজগন্নাথমহাপ্রভুর যত উৎসব আছে, তন্মধ্যে রথযাত্রাই সর্বাপেক্ষা প্রধান। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে নরনারীরা আসিয়া রথে বিরাজিত প্রভুকে দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিয়া থাকেন। রথে বামনদেবকে দর্শন করিলে পুনর্জন্ম হয় না,—হিন্দুদের এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় অশেষ দুঃখকষ্ট

বরণ করিয়া দর্শনলালসায় আকুল প্রাণে তাঁহারা ছুটিয়া আসেন। রথযাত্রার সময় সহস্র সহস্র নরনারীর সমাবেশ হইয়া থাকে।

প্রভু ও ভৃত্য

কঠোপনিষদে বর্ণিত আছে—এই দেহ রথ, আত্মা রথী, ইন্দ্রিয়গুলি অশ্ব, মন লাগাম, বুদ্ধি সারথি।

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥"

যেমন দেহরথে বিরাজিত পরমাত্মাকে ভৃত্যস্থানীয় ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে চালাইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ জগতের নিয়ন্তা, জগতের পালক প্রভুকে রথে অবস্থিত আছেন জানিয়া রথের রজ্জু ধরিয়া সেবকেরা টানিয়া আনন্দিত ও পুলকিত হইয়া থাকেন। পুরীতে অবস্থানকালে চৈতন্য মহাপ্রভু এই ভাবের উড়িয়া ভাষায় রচিত একটি গান করিতেন 'জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউঁ'; পরিমুণ্ডা অর্থাৎ দীনতা প্রকাশ করা, নমস্কার ও প্রশংসা করা। জগবিমোহনকারী জগন্নাথ মহাপ্রভু যাইতেছেন। তাঁহাকে নমস্কার ও নিজেদের আর্তি জানাইবার জন্য চল। এই গান সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না।

চৈতন্যদেবের পার্ষদেরা সাত দলে বিভক্ত হইয়া রথাগ্রে নৃত্য করিতেন। এক এক দলে একজন করিয়া প্রধান গায়ক থাকিতেন; যথা অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর, অচ্যুতানন্দ, শ্রীবাস, সত্যরাজ খান ও হরিদাস। চৈতন্যমহাপ্রভু সকলের দলে যোগ দিয়া নৃত্য করিতেন, তাঁহার দেবদুর্লভ অপূর্ব উদ্দাম নৃত্য, গন্ধর্বনিন্দিত কণ্ঠ আজানুলম্বিত বাহুযুগল, গৌরকান্তি সকলের মন হরণ করিয়া নিত। পূর্বোক্ত গানটি করিয়া চৈতন্যদেব কখনও অন্তর্দশা, কখনও অন্তর্বাহ্যদশা, কখনও বা সমাধি-অবস্থা প্রাপ্ত হইতেন। পুনরায় একটু বাহ্যজ্ঞান আসিলে হুঙ্কার দিয়া উঠিতেন। তাঁহার দেহের রোমাবলি কখনও কণ্টকিত হইত; কখনও তিনি প্রফুল্ল, কখনও বা কাষ্ঠের মত নিশ্চল হইয়া থাকিতেন। জগন্নাথ মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় লীলা তাঁহার মধ্যে সঞ্চার হইত। ভাবপূর্ণ অবস্থায় জজ···গগ · পরি···পরি ·· (জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউঁ) ইহাই বলিতেন। সম্পূর্ণ বলিতে পারিতেন না। ঈশ্বরীয় প্রেমসমুদ্রের তরঙ্গে প্রেমঘন মূর্তিটি যেন তরঙ্গায়িত ও হেলিয়া দুলিয়া বেড়াইতেছে। ইহা যে হাড়মাংসের শরীর দর্শকেরা মনে করিতে পারিত না। নয়নপ্রাণহরণকারী অপূর্ব নৃত্য দর্শন করিয়া দর্শকেরা বুঝিতে পারিতেন না যে, তাঁহারা পৃথিবীতে আছেন—না অন্য কোথাও আছেন। প্রভুর প্রেমের তরঙ্গে সেই সময় প্লাবিত হইয়া তাঁহারা দেশকাল ভুলিয়া যাইতেন। প্রভুর অবস্থানকালে পুরুষোত্তমক্ষেত্রের মহিমা শতগুণে বর্ধিত হইয়াছিল। বর্তমানে তাঁহার স্মৃতি পুরীর সর্বত্র বিজড়িত রহিয়াছে।

এই রথযাত্রার সময় গোপীগীতা পাঠ করিবার কালে প্রতাপরুদ্রকে ভাবাবস্থায় মহাপ্রভু আলিঙ্গন দিয়াছিলেন। ওড়িশার রাজারা নিজেদের জগন্নাথদেবের সেবক বলিয়া ভাবিতেন; প্রভুই এই রাজ্যের মালিক, আমরা তাঁহার ভৃত্যমাত্র এবং তাঁহার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণকারী। ভোগনিবেদনের পর জগন্নাথদেবকে রাজারা পানের ডিবা লইয়া দিতেন। যথাযথভাবে পূজা হইল কিনা, কোন ত্রুটি হইল কিনা, ইহার সবিশেষ তত্ত্ব লইতেন।

ভোগ-নিবেদনের সময় দর্পণে প্রভুর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত না হইলে বুঝা যাইত কোন ত্রুটি বা অপরাধ হইয়াছে। তজ্জন্য নাটমন্দিরস্থিত গরুড়স্তম্ভের নিকট রাজাকে হত্যা দিয়া থাকিতে হইত। স্বপ্নাদেশে প্রভু তাঁহাকে যেরূপ বলিতেন, তদনুযায়ী রাজা ব্যবস্থা করিতেন। কোন ভক্ত হয়ত ব্যাকুল হইয়া ডাকিতেছে, কেহ বা জগন্নাথদেবের ভক্তকে অপমান করিয়াছে, কোন ভক্ত হয়ত গ্রাসাচ্ছাদন

পাইতেছেন না—তজ্জন্য রাজাকে স্বপ্নাদেশের পর যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইত। কখনও কখনও প্রভু নিজে আপদবিপদ হইতে ভক্তকে অলৌকিক উপায়ে রক্ষা করিয়াছেন। পূর্বোক্ত জাগ্রতদেবতার লীলা উৎকল-সাহিত্যে, কাব্যে, ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে এবং সেই প্রাচীন গল্পকথা লোকের মুখে গীত ও অভিনীত হইয়া থাকে। ওড়িয়া ভাষায় পদ্যে রচিত 'দার্চ্যতা ভক্তি' গ্রন্থ হইতে রঘু অরক্ষিতের একটি সংবাদ নিম্নে দেওয়া হইল।

ভক্ত রঘুনাথ

রঘুনাথ ছিলেন মাতাপিতার একমাত্র সন্তান। তাঁহার পিতার নাম কৃষ্ণ মহাপাত্র, মাতার নাম কমলা। তাঁহাদের অগাধ সম্পত্তি ছিল। তাঁহারা প্রভুর ভক্ত ও অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন, কালক্রমে তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়। মাতাপিতার মৃত্যুর পূর্বে এক ধনী কন্যার সহিত রঘুনাথের বিবাহ হইয়াছিল। কন্যাটি অতি সুলক্ষণা ও সতীসাধ্বী, নাম অন্নপূর্ণা।

ঐশ্বর্য নষ্ট ও মাতাপিতার মৃত্যু হওয়ায় রঘুনাথ অসহায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঘরে অন্নসংস্থান না থাকায় তাঁহাকে দরিদ্রাবস্থায় কালাতিপাত এবং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিতে হয়। এককালে যাঁহার অতুল ঐশ্বর্য ও সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল, তিনি কোনমুখে সেই গ্রামেই ভিক্ষা করিবেন? রঘুনাথ দেশে না থাকিয়া পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আসিয়া বাস করিতে থাকেন, সেখানে তিনি নিত্য জগন্নাথদেবকে দর্শন ও স্তবস্তুতি করিতেন এবং সাধনভজনে অধিকাংশ সময় মগ্ন হইয়া থাকিতেন। মঠে মঠে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য সেকালে সর্বসাধারণের জন্য মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা ছিল।

এদিকে কন্যার পিতামাতা ভাবিলেন, রঘু এখন পথের ভিখারী—তাঁহার কুলশীলের কোন মর্যাদা নাই। এরূপ অবস্থায় কোন বড়লোকের পুত্রকে কন্যা সম্প্রদান করাই ভাল। মেয়েটি সুখে থাকিবে। বাসুদেব মহাপাত্র নামে সেইদেশে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার পুত্রের সঙ্গেই বিবাহ দিবার ব্যবস্থা হইল। সতীসাধ্বী অন্নপূর্ণা ঐরূপ প্রস্তাব শুনিয়া মর্মাহত হইলেন। ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন—"প্রভু, আমাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা কর, আমার পতি থাকিতে অন্য কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিব না। আমি আত্মহত্যা করিয়া জীবনের অবসান ঘটাইব"। তিনি আকুলকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন—"হে প্রভু, আমার কাছে আমার পতিকে আনিয়া দাও, নচেৎ তাঁর কাছেই আমাকে লইয়া যাও।" সেই গ্রাম হইতে কয়েকজন নীলাচলে যাইতেছিলেন। অন্নপূর্ণা একখানি চিঠি লিখিয়া তাঁহাদের হাতে দিলেন এবং স্বামীকে দিবার জন্য খুব অনুরোধ করিলেন।

গ্রামের লোকেরা নীলাচলে আসিয়া অনেক খুঁজিয়া রঘুনাথের সন্ধান পাইলেন এবং তাঁহার হস্তে তাঁহারা পত্নীপ্রদত্ত পত্রখানিও অর্পণ করিলেন। দশদিন পরেই অন্নপূর্ণার পুনর্বিবাহ। পদব্রজে দেশে ফিরিতে হইলে একমাস লাগিবে। অথচ না গেলেও পত্নীর আত্মহত্যা-দোষ লাগিবে। উপায়ান্তর না দেখিয়া রঘুনাথ জগন্নাথ মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইলেন এবং কাতরকণ্ঠে স্বীয় মর্মবেদনা জানাইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "হে প্রভু, আমার কোন সহায় নাই, তুমিই আমার সর্বস্ব, একমাত্র সহায়, তোমার নাম বিপদ্‌মোচন" ইত্যাদি প্রার্থনা করিতে করিতে সিংহদ্বারের নিকট ধরনা দিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু জগন্নাথদেব বেতাল নামক অনুচরকে রাত্রি থাকিতেই রঘু অরক্ষিতকে তাঁহার শ্বশুরালয়ে রাখিয়া আসিতে আদেশ দিলেন। বেতাল তদনুযায়ী প্রভাত হইবার পূর্বে তথায় তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দিল। রঘু

অরক্ষিতের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ইহা প্রভুর লীলা।

কন্যার পিতামাতা ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত কাঙাল জামাতা রঘুকে তাঁহাদের দ্বারের সম্মুখে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। অন্নপূর্ণা কিন্তু অপ্রত্যাশিত-ভাবে স্বামীকে সম্মুখে দেখিয়া মহা আনন্দিত ও পুলকিত হইলেন। রঘুকে মারিয়া ফেলিলে কন্যা অন্তকে বিবাহ করিতে রাজী হইবে, ইহা ভাবিয়া পিতামাতা বিষমিশ্রিত খাদ্য তাঁহাকে খাইতে দিলেন। কিন্তু তিনি প্রভুকে সমস্ত অন্ন নিবেদন করিলেন। পত্নী তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন। নিবেদিত অন্ন ফেলিয়া দিলে অপরাধ হইবে ভাবিয়া বিষমিশ্রিত সমস্ত প্রসাদ তিনি গ্রহণ করিলেন। বিষক্রিয়া আরম্ভ হইল। তিনি ঢলিয়া পড়িলেন। প্রাণবায়ু নির্গত হইলে রঘুনাথকে পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা হইল। প্রচারিত হইল সর্পাঘাতে রঘু অরক্ষিতের মৃত্যু হইয়াছে। পতির নিধনের কথা শুনিয়া অন্নপূর্ণা স্থির থাকিতে পারিলেন না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিলেন এবং জ্বলন্ত চিতায় পতির সহগামিনী হইবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করিলেন।

সতীর আর্তনাদে প্রভুর আসন টলিল—তিনি আসিয়া করস্পর্শে রঘু অরক্ষিতকে বাঁচাইলেন। পত্নীকে সঙ্গে লইয়া নীলাচলে যাইবার পথে অন্য এক বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। পূর্বোক্ত যে রাজপুত্রের সঙ্গে অন্নপূর্ণার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল, তিনি সসৈন্যে আসিতেছেন জানিয়া পতি-পত্নী বিচলিত হইলেন। ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহারা ব্যাকুল ভাবে প্রভুকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ছদ্মবেশে জগন্নাথ বলভদ্র সৈন্যসহ উপস্থিত হইয়া বিপদ হইতে ভক্তকে উদ্ধার করিলেন। এইরূপে সমস্ত দুঃখবিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া উভয়ে নীলাচলে বাস করিতে লাগিলেন। দেহান্তে এই দিব্যদম্পতী বাঞ্ছিতলোকে গমন করেন।

জগন্নাথদেবকে অবলম্বন করিয়া এইরূপ ভূরি ভূরি আখ্যায়িকা ভক্তদের চরিত্র ও জাগ্রত দেবতার লীলা বর্ণনা করা হইয়াছে।

রথত্রয়

আমরা এখন রথযাত্রার প্রসঙ্গ আলোচনা করিব। আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা আরম্ভ হয়। জগন্নাথদেবের রথের চাকার সংখ্যা ষোল, বলভদ্রের রথের চাকা চৌদ্দ এবং সুভদ্রা দেবীর বার। যথাক্রমে রথত্রয়ের নাম নন্দিঘোষ, তালধ্বজ ও দর্পদলন। তিনটি রথ বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে। নন্দিঘোষের বর্ণ রক্ত ও পীত, তালধ্বজের নীল ও রক্ত, দর্পদলনের রক্ত ও কৃষ্ণ। শাস্ত্রানুসারে বিবিধ পতাকা ও বিবিধ কারুকার্যে রথত্রয় মণ্ডিত হইয়া থাকে। জগন্নাথ-দেবের রথে গরুড়ধ্বজ, বলভদ্রের রথে লাঙ্গুলধ্বজ, সুভদ্রার রথে পদ্মধ্বজ থাকে। রথের বেদী হইতে জগন্নাথের রথের উচ্চতা তেইশ হাত, বলদেবের বাইশ হাত, সুভদ্রার রথের একুশ হাত। আষাঢ় শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে রথগুলির প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। প্রতিষ্ঠার পর হইতে কোন জীবজন্তু, পক্ষী, মার্জার, এমন কি মনুষ্য পর্যন্ত রথের উপর যেন না বসে, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়।

আষাঢ় শুক্লপক্ষে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত দ্বিতীয়ার দিনে সেবকেরা প্রভাতে প্রভুকে অর্চনা করিয়া খিচুড়ি ভোগ দিয়া থাকে। তাহার পরে প্রার্থনার সুমধুর স্বর ভক্তকণ্ঠে জাগিয়া উঠে। প্রার্থনান্তে মহাপ্রভু রথে আরোহণ করিবার জন্য যাত্রা করিয়া থাকেন। ইহাকে 'পহন্তি বিজে' বলা হয়। 'পহন্তি বিজে' অর্থ—ধীরে ধীরে বসিয়া বসিয়া চলা। পহন্তির সময়ে বিবিধ বাদ্য, নানাবিধ মাঙ্গলিক সঙ্গীত ও নৃত্য হইয়া থাকে। এই সময় প্রচুর পুষ্পবৃষ্টি করা হয়। প্রথমে সুদর্শন চক্র, তাহার পরে বলরাম, তাহার পরে সুভদ্রা, শেষে জগন্নাথদেব রথে আসেন।

পহন্তি বিজে করিবার পূর্বে স্বয়ং রাজা ঝাড়ু হস্তে রথক্ষেত্র ও পথ মার্জনা করেন।

এক কিংবদন্তী আছে ওড়িশার রাজা পুরুষোত্তমদেব (প্রতাপরুদ্রের পিতা) রথের সময় ঝাড়ু হস্তে মার্জনা করিয়া থাকেন শুনিয়া কাঞ্চি কাবেরীর রাজা ঘৃণা প্রকাশ করেন এবং পূর্ব প্রস্তাবমত তাঁহার কন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হন। সেজন্য পুরুষোত্তমদেব কাঞ্চি রাজার সহিত যুদ্ধ করিলেন। প্রথমে তিনি সেই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া জগন্নাথদেবের শরণাপন্ন হন। রাজার প্রার্থনায় জগন্নাথদেব ও বলভদ্র সৈন্যসহ দুইটি অশ্বপৃষ্ঠে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। রাজা পুরুষোত্তম জয়লাভ করিলেন।

জগন্নাথ, বলভদ্র সৈন্যবেশে নিজেদের রত্ন অঙ্গুরীয় বাঁধা দিয়া মানিক নাম্নী গোয়ালিনীর নিকট হইতে দই দুধ খাইয়াছিলেন। পরে সেই গোয়ালিনীর সঙ্গে রাজার দেখা হইলে রত্ন অঙ্গুরীয় দেখাইয়া তিনি সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেন। সন্তুষ্ট হইয়া রাজা তাহাকে যে একখানি গ্রাম দিয়াছিলেন, উহা মানিক পাটনা গ্রাম নামে প্রসিদ্ধ। রথযাত্রার সময় প্রভুর যাহাতে কষ্ট না হয়, সেই জন্য পথের স্থানে স্থানে ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে এবং দর্পণে তাঁহাকে কর্পূরমিশ্রিত শীতল জলে অভিষিক্ত করা হয়।

অপরাহ্ণে রথ টানা হয়। রথগুলি গুণ্ডিচা বাড়ীতে পৌঁছিবার পর মন্দিরাভ্যন্তরস্থিত বেদিতে দেবতাদিগকে স্থাপন করা হয়। এখানে তাঁহারা থাকেন সাতদিন, বড় মন্দিরে থাকাকালীন যেরূপ ভোগরাগ দেওয়া হয়, সেইরূপ এখানেও হইয়া থাকে। এখানে মহাপ্রসাদও হয়।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের নিকট ঠাকুররা সাতদিন থাকেন। গুণ্ডিচা মণ্ডপে দেবতারা গেলেও প্রতিদিন রথস্থ ধ্বজগুলির পূজা হয়। আকস্মিক কোনও দুর্ঘটনা দ্বারা রথের কোন ক্ষতি না হয়, সেইজন্য ভূতপ্রেতাদি ও দিক্‌পালদিগকে যথাবিধি বলি (পূজা) দেওয়া হয়।

অষ্টমীর দিন তিনটি রথকে দক্ষিণাভিমুখী করিয়া মাল্য, পতাকা ও চামর দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। নবমীতে সকালবেলা মন্দির হইতে ঠাকুরদের আনিয়া রথে স্থাপন করা হয়। সেইদিন রথ টানিয়া বড় মন্দিরের সিংহদ্বারের নিকট রথগুলি রাখা হয়। ঠাকুর আসিলেও সহজে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারেন না। লক্ষ্মীঠাকুরানী রাগ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া থাকেন। জগন্নাথদেবের সহিত লক্ষ্মীদেবীর বচনিকা আরম্ভ হয়, তারপর লক্ষ্মী দ্বার খুলিয়া দিলে ঠাকুর মন্দিরে প্রবেশ করেন।

গুণ্ডিচা বাড়ী

বড় মন্দিরের দেড় মাইল উত্তর দিকে গুণ্ডিচা মন্দির অবস্থিত। এই গুণ্ডিচা মন্দিরকে মহাবেদী, যজ্ঞমণ্ডপ, জন্মস্থান, জনকপুরী ও গুণ্ডিচা মণ্ডপ বলা হয়। প্রাচীন কালে ইন্দ্রদ্যুম্ন এইখানে নৃসিংহমূর্তি স্থাপন করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া গুণ্ডিচাবাড়ী, বেদী রচনা করিয়া উহাতে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া যজ্ঞমণ্ডপ এবং ঠাকুরদের এখানে উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া জন্মস্থান বা জনকপুরী বলা হয়। স্কন্দপুরাণান্তর্গত উৎকলখণ্ডে বর্ণিত আছে—

গুণ্ডিচামণ্ডপং নাম যত্রাহমজনং পুরা।
অশ্বমেধসহস্রস্য মহাবেদী তবাভবৎ॥

আমি যেখানে পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলাম, সেখানে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সেই গুণ্ডিচা-মণ্ডপে আমাকে লইয়া যাইবে, উহা আমার জন্মস্থান ও অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। আমি সেখানে অনেকদিন অধিষ্ঠিত ছিলাম বলিয়া আমার ঐ স্থানের প্রতি অসীম প্রীতি রহিয়াছে।

মমোৎপত্তেশ্চ নিলয়ং প্রীতিকৃন্মম শাশ্বতম্।
বহুকালং স্থিতশ্চাহং মমাস্মিন্ প্রীতিরুত্তমা॥

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন গুণ্ডিচা শব্দ দ্রাবিড় ভাষা হইতে আসিয়াছে। তেলেগুতে

গুণ্ডিচার অর্থ কুটীর। আদিম অধিবাসীরা জগন্নাথ-দেবকে ঐদিন মন্দির হইতে বাহির করিয়া কুটীরে রাখিতেন বলিয়া কালক্রমে উহার গুণ্ডিচা নাম হইয়াছে। ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রীর নাম গুণ্ডিচাদেবী ছিল, তদনুসারে গুণ্ডিচা হইতে পারে।

রথ-নির্মাণ-বিধি

প্রত্যেক বৎসর ঠাকুরদের রথ নূতন ভাবে নির্মাণ করা হইয়া থাকে। পূর্ব বৎসরের রথ ব্যবহার হয় না। উহা নিলাম হইয়া যায়। বৈশাখ মাসের রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে রাজা সংকল্প করিয়া আচার্য ও তিনজন সূত্রধরকে বরণ করিয়া থাকেন, অরণ্যে যেখানে ভাল কাঠ পাওয়া যায়, সেখানে পুরোহিত যাইয়া অরণ্যে অগ্নি স্থাপন করিয়া সুপ্র-শস্থ পাঠ ও ১০৮ আহুতি প্রদান করেন। প্রত্যেক বৃক্ষের মূলে ঘৃতের দাগ দেওয়া হয় এবং দিক্‌পাল ও ক্ষেত্রপালদের জন্য পৃথক পৃথক বলি দেওয়া হয়। বনস্পতির প্রীতির জন্য পায়সান্ন দ্বারা ১০০টি আহুতি দেওয়া হয়; তারপর আচার্য ভগবানকে স্মরণ করিয়া দাগদেওয়া বৃক্ষগুলিতে কুঠার দ্বারা আঘাত করেন। এইরূপে আচার্য সূত্রধরদের ছেদনকার্যে নিযুক্ত করেন। প্রত্যেক বৎসরের রথনির্মাণের পূর্বে যথোক্ত বিধি পালিত হয়।

নব-কলেবর

অবতার বা মহাপুরুষদের যেমন ভৌতিক দেহ জরাজীর্ণ হইয়া যায় সেইরূপ অবতারমধ্যে পরিগণিত জগন্নাথ প্রভু কলেবর-পরিবর্তন করেন। যে বৎসরে আষাঢ়ে মলমাস পড়ে, অর্থাৎ দুইটা আষাঢ় মাস হয় সেই বৎসরে ঠাকুর কলেবর-পরিবর্তন করিয়া নূতন কলেবর ধারণ করেন। কেহ কেহ বলেন, এই কলেবরপরিবর্তনপ্রথা খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে চলিয়া আসিতেছে। বিশ্বাবসু-বংশীয় শবর জাতিরা জগন্নাথদেবকে পূজা করিয়া আসিতেছেন। কিংবদন্তী আছে বহুপূর্বে প্রাচীন-কালে জৈনেরা এই মূর্তি পূজা করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে শবরজাতিরা ছাড়াইয়া নিয়া আসে। তাঁহারা আনিয়া মূর্তির পরিবর্তন করিয়া নীলমাধব নাম দিয়া পূজা করেন। যে বৎসর মূর্তি উদ্ধার করা হইয়াছিল, সেই বৎসর দুইটি আষাঢ় মাস পড়িয়াছিল, সেই মাসে তাহারা মূর্তি পরিবর্তন করিয়াছিল। উহা হইতেই নবকলেবর-প্রথা চলিয়া আসিতেছে।

দুইটি আষাঢ় মাসে জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা ঘট পরিবর্তন করেন। ঠাকুরদের জীর্ণ কলেবর-গুলিকে মন্দিরের মধ্যে 'কুইলি বৈকুণ্ঠ' স্থানে প্রোথিত করা হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তীয় শবরেরা এই আষাঢ় মাসকে পবিত্র মনে করিয়া থাকেন। যখন ঠাকুরদের কলেবর প্রোথিত করা হয়, তখন হইতে 'দইতারা' (শবররাজ বিশ্বাবসুর কন্যা ফুলের বংশধর) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পালন করেন। উহারাই প্রভুর জ্ঞাতি-কুটুম্ব। নয়দিন যথাবিধি তাঁহারা অশৌচ পালন করিয়া থাকেন।

বিগ্রহনির্মাণ যে কোন কাষ্ঠে হয় না। উহা নিম্বকাষ্ঠের দ্বারা নির্মিত হয়। যেকোন নিম্ব-বৃক্ষে হয় না। বহু প্রকার বিধি আছে, কোন নির্জন স্থানে সাধুর আশ্রমে নিম্ববৃক্ষ থাকিবে। উহা কীটদষ্ট হইলে হইবে না। সেই বৃক্ষমূলে ধূপ ধুনা প্রত্যহ দেওয়া চাই। উহাতে একটি বিষধর সর্পের বাস থাকিবে। গাছের উপর কোন পক্ষীর বাসা থাকিবে না। সে বৃক্ষের রং ধবল হইবে, শঙ্খের চিহ্ন থাকিবে এবং তাহাতে সাতটি শাখা থাকিবে।

এইরূপে বলভদ্র, সুভদ্রা ও সুদর্শনের প্রত্যেকের একটি লক্ষণযুক্ত নিম্ববৃক্ষের প্রয়োজন হয়। পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত নিম্ববৃক্ষ সহজে পাওয়া যায় না। সেবকরা পুরী জেলার মধ্যে কাকটপুরস্থ সর্বমঙ্গলার নিকট হত্যা দিয়া থাকেন। কোন্

দিকে গেলে সেইরূপ বৃক্ষ পাওয়া যাইবে দেবী স্বপ্নে আদেশ করেন। তদনুসারে সেবকেরা উহার অন্বেষণে চলিয়া যান। সেই সেই নিম্ববৃক্ষের মূলে পূজা-অর্চনা, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। তারপরে বৃক্ষ ছেদন করিয়া নূতন শকটে আনিয়া মন্দিরাভ্যন্তরস্থ কুইলি বৈকুণ্ঠে দারু নির্মিত হয়। জগন্নাথদেবের নাভিস্থলে যে কৌট আছে (আত্মারাম কৌট) উহা বাহির করিয়া নূতন দারুমূর্তির নাভিস্থলে রাখা হয়। যে লোকটি বাহির করে তাহার চোখ বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ভূতাবিষ্টের মত উহা আনিয়া নূতন কলেবরে স্থাপন করে। সে কৌটের মধ্যে কি আছে আজ পর্যন্ত কেহ দেখে নাই; কেহ কেহ বলেন বুদ্ধদেবের দন্ত আছে।

রথযাত্রার ইতিবৃত্ত

রথ-শব্দের ব্যবহার বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়। আর্য অনার্য উভয়ে এই রথ যে ব্যবহার করিতেন উহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীনকালের লোকেরা শোভাযাত্রার সহিত রথে চড়িয়া ভ্রমণ ও যুদ্ধবিগ্রহাদি করিতেন। দেবতারাও রথযান অতিশয় ভালবাসিতেন। কোন্ দেবতার কোন্ রথ দ্রুতগামী ও মনোহর উহাও স্থানে স্থানে বর্ণিত আছে। অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সূর্যদেব, ইন্দ্র, বিষ্ণু, বরুণ, কুবের, ইঁহারা সকলেই রথ ব্যবহার করিতেন। ইঁহাদের রথ অতি মনোহর ও অতি দ্রুতগামী ছিল। উপনিষদে ও সংহিতাভাগে ভূরি ভূরি রথের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। জনসমাজে যা বিশেষ প্রচলিত ছিল, উহারই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়া থাকে। রামায়ণে রঘুবংশীয় রাজাদের, মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভাস সম্ভবত পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দের কবি, তিনিও তাঁহার স্বপ্নবাসবদত্ত-নামক নাটকে রথের বর্ণনা করিয়াছেন। কালিদাস তাঁহার পরবর্তী কবি, এতদ্ব্যতীত সেকালে রোম ও গ্রীসবাসীরা রথ ব্যবহার করিতেন। দশাশ্ববাহিত রথে চড়িয়া শোভাযাত্রা-সহকারে রাজা যাত্রা করিতেছেন। বর্ণনা আছে রথগুলি কাষ্ঠনির্মিত, কারুকার্যমণ্ডিত চাকাগুলি লোহার ও অন্য কোন ধাতুর পাত দিয়া মুড়া থাকিত। যেগুলি যুদ্ধে ব্যবহার করা হইত সেগুলির চক্র সুতীক্ষ্ণ ছিল।

সর্বজন-আদৃত পবিত্র রথে লোকে তাহাদের অভীষ্ট দেবতাকে যে বহন করিয়া লইবে তাহাতে আর আশ্চর্যের কি আছে? তাহা হইতে অনুমান করা যায় রথযাত্রা প্রাচীন কালেও ছিল।

নেপালে বৈশাখ মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে ভৈরব ও ভৈরবীর রথযাত্রা এবং বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে কুমারী রথযাত্রা প্রসিদ্ধ, জৈনদের মধ্যেও এই রথযাত্রা প্রচলিত ছিল। পূর্বে উজ্জয়িনীতে জৈনেরা উচ্চ আধ্যাত্মিকতা-সম্পন্ন তীর্থঙ্করকে রথে বসাইয়া নগর পরিভ্রমণ করাইতেন। অনেক বৌদ্ধক্ষেত্রেও বুদ্ধদেবের রথযাত্রা হইত। চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়ান ইহা দেখিয়াছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীতে ফা হিয়ান পাটলিপুত্রের রথযাত্রা-সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়াছেন।

ঐতিহাসিকদের মতে অশোকের কলিঙ্গ-বিজয়ের পর সকলে বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। শবররা পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। ত্রিরত্নের প্রতীক জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা। জগন্নাথ—বুদ্ধ, বলভদ্র—সংঘ, সুভদ্রা—ধর্ম। জগন্নাথ-নামের মূলে বুদ্ধ আছেন। বৌদ্ধেরা ধর্মকে নারীমূর্তি বলিয়া অভিহিত করেন। ভাই-ভগিনীর মত সংঘের সম্পর্ক থাকায় বলভদ্র সংঘ। বৌদ্ধধর্মে যেমন জাতিভেদ নাই তেমনি জগন্নাথ-মহাপ্রসাদেও জাতিভেদ নাই। উহা যে বৌদ্ধধর্মের অবশেষ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

হন্টর সাহেব বলেন, জগন্নাথদেবের রথযাত্রা বৌদ্ধদের দ্বারা অনুষ্ঠিত দন্ত-উৎসবের নকল।

জাপানে ত্রিরত্নের রথযাত্রা প্রচলিত। ইহা উহার সাদৃশ্য বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ফর্গুসন সাহেব বলেন, বুদ্ধদেবের জন্ম ও নির্বাণের দিন বৈশাখী পূর্ণিমা; বৌদ্ধেরা ঐ দিনে বুদ্ধের দেহাবশেষ রথে রাখিয়া রথযাত্রা করিয়া থাকেন। ইহা উহারই অনুকরণ। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রও ঐরূপ মতপোষণ করেন। যাহা হউক, দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের লীলা চলিতেছে, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সহস্র সহস্র লোক জীবন ধন্য করিয়াছে, কত ধর্মশাস্ত্র ও কাব্য রচিত হইয়াছে।

এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে কত ধর্মের উত্থান-পতন হইয়াছে। কত রাজার রাজ্যশাসন প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, পুনরায় লুপ্ত হইয়াছে, কত বড় বড় দিগ্‌বিজয়ী সম্রাট কালের গর্ভে বিলীন হইয়াছে উহার সমস্তই জগন্নাথদেব সাক্ষ্য দিতেছেন।

হে প্রভু, হে সাক্ষিন্, তুমি সকলের মঙ্গল কর, তুমি সকলকে ধর্মে মতি দাও।

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে—ইহাই প্রার্থনা।

ওঁ তৎ সৎ।